

বাংলাদেশের নদ-নদী ও প্রাকৃতিক সম্পদ

বাংলাদেশ একটি নদীমাতৃক দেশ। নদীগুলোই যেন বাংলাদেশকে বাঁচিয়ে রেখেছে। অসংখ্য নদ-নদী উত্তরের হিমালয় এবং ভারতের পাহাড়ি অঞ্চল থেকে নেমে এসেছে বাংলাদেশে ভূখণ্ডে। এগুলো আকাবীকা পথে চলেছে। অনেকগুলো নদী বেশ দীর্ঘ এবং প্রশস্ত। অনেক নদ-নদী আমাদের মানচিত্র থেকে অনেক বছর আগেই হারিয়ে গেছে। কিছু কিছু নদী হারিয়ে যাওয়ার পথে। বর্তমানে ছোটো বড়ো মিলিয়ে বাংলাদেশে ভূখণ্ডে ১০০৮ টি নদ-নদী রয়েছে। এগুলোর আয়তন দৈর্ঘ্যে ২২,১৫৫ কি.মি। এসব নদী আমাদের প্রধান সম্পদ। নদী ছাড়াও বাংলাদেশে ভূমি, বনভূমি, কৃষি জমি, খনিজ পদার্থসহ বেশকিছু প্রাকৃতিক সম্পদ রয়েছে। এই সম্পদ আহরণ, ব্যবহার, বর্ধন ও সংরক্ষণের ওপর বাংলাদেশের জনগণের অস্তিত্ব অনেকাংশে নির্ভর করছে। এ অধ্যায়ে আমরা আমাদের নদ-নদী ও প্রাকৃতিক সম্পদ সম্পর্কে জানব এবং এগুলো রক্ষার জন্য সচেতন হব।



এ অধ্যায় শেষে আমরা-

- বাংলাদেশের প্রধান নদ-নদীগুলোর (পদ্মা, ব্রহ্মপুত্র, যমুনা, মেঘনা, কর্ণফুলী, তিস্তা, পশুর, সাজু, ফেনী, নাফ নদী ও মাতামুরী) উৎপত্তিস্থল ও প্রবাহ পথের বিবরণ দিতে পারব এবং এগুলো সজরক্ষণের গুরুত্ব বিশ্লেষণ করতে পারব;
- নদী-নদীর উপরে জনবসতির নির্ভরশীলতা ব্যাখ্যা করতে পারব;
- বাংলাদেশের কোনো কোনো অংশে পানির অভাবের কারণের সাথে সংশ্লিষ্ট দেশসমূহের নদীর প্রভাব বিশ্লেষণ করতে পারব;
- বাংলাদেশের কোনো কোনো অংশে পানির অভাবের কারণে সৃষ্ট সমস্যা বিশ্লেষণ করতে পারব এবং সমাধান পদক্ষেপ সম্পর্কে মতামত ব্যাখ্যা করতে পারব;
- যাতায়াত, জলবিদ্যুৎ ও বাণিজ্যের ক্ষেত্রে নদীপথের ভূমিকা বিশ্লেষণ করতে পারব;
- পানির অভাব দূরীকরণে নদী সংরক্ষণের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করতে পারব;
- প্রাকৃতিক সম্পদের ধারণা ব্যাখ্যা করতে পারব;
- বাংলাদেশের প্রাকৃতিক সম্পদের (খনিজ, বনজ, কৃষিজ, পানি-সমুদ্রসম্পদ (মৎস্যসম্পদ), সৌর সম্পদ, সাথে দক্ষিণ এশিয়ার কয়েকটি দেশের (ভারত, মিয়ানমার, নেপাল) প্রাকৃতিক সম্পদের তুলনা করতে পারব;
- পানিসম্পদ ব্যবস্থাপনার ধারণা ব্যাখ্যা করতে পারব;
- বাংলাদেশের পানি ও খাদ্য নিরাপত্তায় পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনার গুরুত্ব ব্যাখ্যা করতে পারব;
- বাংলাদেশের বনভূমির শ্রেণিবিভাগ বর্ণনা করতে পারব;
- বাংলাদেশের অর্থনীতিতে এসব সম্পদের গুরুত্ব বিশ্লেষণ করতে পারব;
- প্রাকৃতিক সম্পদ সংরক্ষণে সচেতন হব।

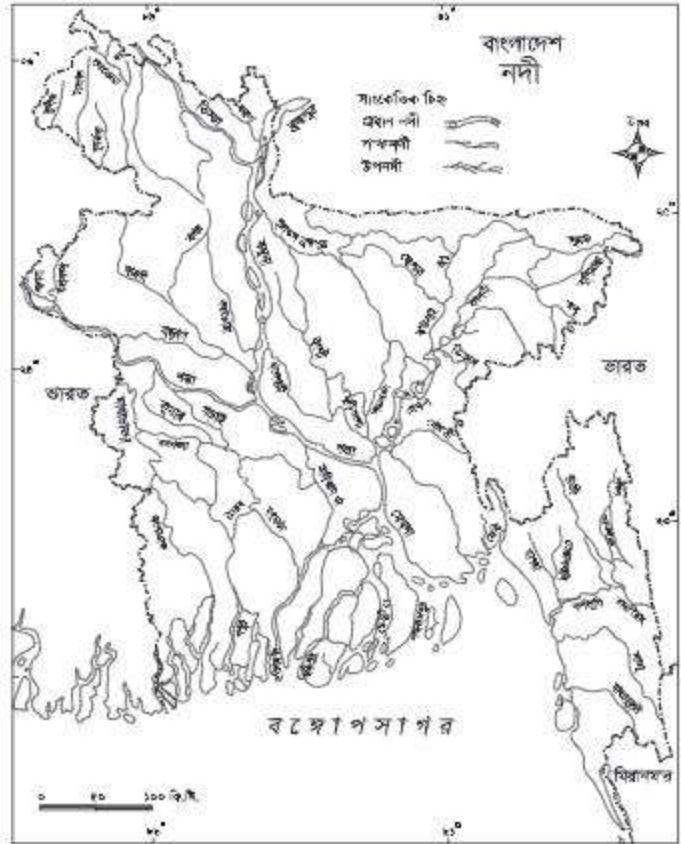
পরিচ্ছেদ ৫.১: বাংলাদেশের নদ-নদী ও পানিসম্পদ

বাংলাদেশের প্রধান নদীগুলো হচ্ছে- পদ্মা, মেঘনা, যমুনা, কর্ণফুলী, ব্রহ্মপুত্র, তিস্তা, পশুর, সাজু প্রভৃতি। বাংলাদেশ ভূখণ্ডে চিরচেনা ও পরিচিত বেশির ভাগ নদীর উৎপত্তিস্থল হিমালয়, তিব্বত, আসামের বরাক এবং সুসাই পাহাড়। এগুলো শেষ পর্যন্ত বঙ্গোপসাগরে মিলিত হয়েছে।

পদ্মা : পদ্মা নদী ভারত ও ভারতের উত্তরবঙ্গে গঙ্গা এবং বাংলাদেশে পদ্মা নামে পরিচিত। এর উৎপত্তিস্থল মধ্য হিমালয়ের গাঙ্গেয় ত্রী হিমবাহে। উত্তর ভারতের কয়েকটি রাজ্য অতিক্রম করে গঙ্গা রাজশাহী জেলা দিয়ে

পদ্মা নামে বাংলাদেশে প্রবেশ করেছে। এটি গোয়ালন্দের নিকট ব্রহ্মপুত্রের প্রধান ধারা যমুনার সঙ্গে মিলিত হয়েছে। চাঁদপুরে এসে এ নদী মেঘনার সঙ্গে মিলিত হয়ে বরিশাল ও নোয়াখালী অতিক্রম করে বঙ্গোপসাগরে পতিত হয়েছে। বাংলাদেশের অন্যতম বৃহত্তম নদী গঙ্গা-পদ্মা বিধৌত অঞ্চলের আয়তন ৩৪,১৮৮ বর্গ কি.মি.। পশ্চিম থেকে পূর্বে নিম্নগঙ্গায় অসংখ্য শাখা নদীর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে- ভাগীরথী, হুগলি, মাথাভাঙ্গা, ইছামতী, ভৈরব, কুমার, কপোতাক্ষ, নবগঙ্গা, চিত্রা, মধুমতী, আড়িয়াল খাঁ ইত্যাদি।

ব্রহ্মপুত্র এবং যমুনা : তিব্বতের মানস সরোবরে ব্রহ্মপুত্র নদের উৎপত্তি হয়েছে। আসাম হয়ে বাংলাদেশের কুড়িগ্রাম জেলায় এটি প্রবেশ করেছে। ব্রহ্মপুত্রের প্রধান ধারাটি এক সময়ে ময়মনসিংহের মধ্য দিয়ে উত্তর-পশ্চিমদিক থেকে দক্ষিণ-পূর্বদিকে আড়াআড়িভাবে প্রবাহিত হতো। কিন্তু ১৭৮৭ সালে সংঘটিত ভূমিকম্পে ব্রহ্মপুত্রের তলদেশ উত্থিত হওয়ায় পানি ধারণ ক্ষমতার বাইরে চলে যায় এবং নতুন স্রোতধারার একটি শাখা নদীর সৃষ্টি হয়। এই নতুন স্রোত ধারাটি যমুনা নামে পরিচিত হয়। এটি দক্ষিণে গোয়ালন্দ পর্যন্ত যমুনা নদী বলে পরিচিত। যমুনার শাখা নদী ধলেশ্বরী এবং ধলেশ্বরীর শাখা নদী- বুড়িগঙ্গা। ধরলা ও তিস্তা ব্রহ্মপুত্রের উপনদী। করতোয়া ও আত্রাই হলো যমুনার উপনদী। ব্রহ্মপুত্রের দৈর্ঘ্য ২৮৯৭ কি.মি.। এর অববাহিকার আয়তন ৫,৮০,১৬০ বর্গ কি.মি. যার ৪৪,০৩০ বর্গ কি.মি. বাংলাদেশে অবস্থিত।



চিত্র ৫.১ : বাংলাদেশের নদ-নদীর মানচিত্র

মেঘনা : আসামের বরাক নদী নাগা-মণিপুর অঞ্চলে উৎপত্তি হয়ে সিলেটের সুরমা ও কুশিয়ারা নদীর সাথে মিলিত হয়েছে। এই মিলিত ধারা সুনামগঞ্জ জেলার আজমিরিগঞ্জের কাছে কালনী নামে দক্ষিণ-পশ্চিমদিকে অগ্রসর হয়ে মেঘনা নাম ধারণ করেছে। এটি ভৈরব বাজার অতিক্রম করে পুরাতন ব্রহ্মপুত্রের সঙ্গে মিলিত হয়েছে। মুন্সীগঞ্জের

কাছে বুড়িগঙ্গা, ধলেশ্বরী ও শীতলক্ষ্যার মিলিত জলধারাই মেঘনায় এসে যুক্ত হয়েছে। সেখান থেকে চাঁদপুরের কাছে পদ্মার সঙ্গে মিলিত হয়ে বিস্তৃত মোহনার সৃষ্টি করেছে। এটি পতিত হয়েছে বঙ্গোপসাগরে। মনু, তিতাস, গোমতী, বাউলাই মেঘনার শাখা নদী। বর্ষার সময় প্রাবন ও পলি মাটিতে মেঘনা বাংলাদেশের উর্বরতা বৃদ্ধি করে।

কর্ণফুলী : বাংলাদেশের দক্ষিণ পূর্বাঞ্চলের প্রধান নদী কর্ণফুলী। এর উৎপত্তিস্থল লুসাই পাহাড়ে। ৩২০ কি.মি. দৈর্ঘ্যের এ নদীটি চট্টগ্রাম শহরের খুব কাছ দিয়ে বঙ্গোপসাগরে পতিত হয়েছে। কর্ণফুলীর প্রধান উপনদী হচ্ছে কান্তাই,

হালদা, কাসালাং ও রাঙাশিয়াং। বাংলাদেশের প্রধান সমুদ্রবন্দর চট্টগ্রাম কর্ণফুলীর তীরে অবস্থিত। পানি বিদ্যুৎকেন্দ্র এবং চট্টগ্রাম বন্দরের জন্য এ নদীর গুরুত্ব অধিক।

তিস্তা নদী : সিকিমের পার্বত্য অঞ্চল থেকে উৎপত্তি হয়ে তিস্তা নদী ভারতের জলপাইগুড়ি ও দার্জিলিং-এর মধ্য দিয়ে নীলফামারী জেলার ডিমলা উপজেলার পূর্ব ছাতনাই হয়ে বাংলাদেশে প্রবেশ করেছে। এই নদী ১৭৮৭ সালের প্রবল বন্যায় গতিপথ পরিবর্তন করে ব্রহ্মপুত্রের একটি পরিত্যক্ত গতিপথে প্রবাহিত হতে থাকে। গতিপথ পরিবর্তনের পূর্বে এটি গঙ্গা নদীতে মিলিত হয়েছিল। তিস্তা নদীর বর্তমান দৈর্ঘ্য ১৭৭ কি. মি. ও প্রস্থ ৩০০ থেকে ৫৫০ মিটার।

বাংলাদেশের উত্তরাঞ্চলের পানি নিষ্কাশন ব্যবস্থায় তিস্তা নদীর ভূমিকা সর্বাধিক। তিস্তা ব্যারেজ প্রকল্পটি ১৯৯৭-১৯৯৮ সালে নির্মিত হয়। ব্যারেজটি ঐ অঞ্চলে পানি সংরক্ষণ, পানি নিষ্কাশন, পানি সেচ ও বন্যা প্রতিরোধে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখার কথা থাকলেও নানা কারণে এর পূর্ণ উপযোগিতা বাংলাদেশ এখনো পায়নি।

পশুর নদী : খুলনার দক্ষিণে ভৈরব বা বুপসা নদী। এটি আরও দক্ষিণে প্রবাহিত হয়ে ত্রিকোনা ও দুবলা দ্বীপদ্বয়ের ডানদিক দিয়ে মংলা বন্দরের দক্ষিণে সুন্দরবনের ভিতর দিয়ে বঙ্গোপসাগরে পড়েছে। প্রায় ১৪২ কি. মি. দীর্ঘ ও ৪৬০ মিটার থেকে ২.৫ কি. মি. প্রস্থ এই নদীর গভীরতা এত বেশি যে, সারা বছর সমুদ্রগামী জাহাজ এর মোহনা দিয়ে অনায়াসে মংলা সমুদ্রবন্দরে প্রবেশ করতে পারে। খুলনা-বরিশাল নৌপথ হিসেবে পশুর নদী গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

কাজ

একক : গ্রামীণ অর্থনীতিতে নদীর প্রভাব চিহ্নিত কর।
একক : নদীপ্রবাহ দুর্বলতার কারণ চিহ্নিত কর।

সাপু-ফেনী, নাফ, মাতামুরী : সাপু নদী উত্তর আরাকান পাহাড় থেকে নির্গত হয়ে বান্দরবান জেলার থানছি উপজেলা দিয়ে বাংলাদেশে প্রবেশ করে বঙ্গোপসাগরে পতিত হয়েছে। এটি ২৯৪ কি.মি. দীর্ঘ। পার্বত্য ত্রিপুরায় উৎপত্তি হয়ে ফেনী জেলায় প্রবেশ করেছে ফেনী নদী। সন্দ্বীপের উত্তরে ফেনী নদী বঙ্গোপসাগরে পতিত হয়েছে। বাংলাদেশ মিয়ানমারের সীমান্তে নাফ নদী অবস্থিত। এর মোহনা অত্যন্ত প্রশস্ত। এই নদী বঙ্গোপসাগরে পতিত হয়েছে। এর দৈর্ঘ্য প্রায় ৫৬ কি. মি। অন্যদিকে লামার মাইভার পর্বতে মাতামুরী নদীর উৎপত্তি হয়েছে। নদীটি কক্সবাজার জেলার চকরিয়ার পশ্চিম পাশ ঘেঁষে বঙ্গোপসাগরে পতিত হয়েছে। এর দৈর্ঘ্য প্রায় ১২০ কি.মি.।

বাংলাদেশের অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের ওপর উল্লিখিত নদীসমূহের প্রভাব অপরিসীম। সেচের পানি, শিল্পে ব্যবহৃত পানি ও জল বিদ্যুৎ শক্তির উৎস এসব নদী। তাছাড়া মাছের উৎসও হচ্ছে নদী। নদী আমাদের পরিবহন ও যোগাযোগের একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রধান মাধ্যম। জমির উর্বরা শক্তি বৃদ্ধিতে এসব নদী পলি বহন করে আনে। নদীমাতৃক বাংলাদেশের কৃষি, শিল্প, ব্যবসায়-বাণিজ্য, পরিবহন ইত্যাদি বহুলাংশে নদীর ওপর নির্ভরশীল বলে অর্থনৈতিক উন্নয়নে নদীর গুরুত্ব অপরিসীম। নদীর প্রবাহে বাধা, নদীতে শিল্প ও জলখাবারের বর্জ্য ফেলা, পলি-নিষ্কাশন প্রবাহ যুক্ত করা, নদী দখল প্রভৃতি কারণে আমাদের দেশের অনেক নদীর প্রবাহ দুর্বল হয়ে পড়ছে। নদীর পানি দূষিত হচ্ছে এবং নদীর নাব্য হারিয়ে যাচ্ছে। এসব নদী সংরক্ষণে আমাদের সকলকেই অধিক সচেতন হতে হবে।

নদ-নদী ও জনবসতির পারস্পরিক সম্পর্ক

প্রাচীন যুগ থেকে মানুষ নদ-নদীর তীরবর্তী সমতল ভূমিতে বসবাস শুরু করে। কেননা, নদ-নদী থেকে মানুষের প্রাত্যহিক ব্যবহার্য পানি পাওয়া নিশ্চিত থাকে। এছাড়া কৃষিকাজের জন্যে পানির জোগানও নদী থেকে দেওয়া সম্ভব। জীবনধারণের জন্য কৃষির পাশাপাশি মাছ শিকার ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত। নদ-নদীই মানুষের খাদ্য ও রোজগারের

প্রধান উৎস হিসেবে ভূমিকা পালন করে। পৃথিবীর সকল সভ্যতা ও জনবসতি গড়ে ওঠার পিছনে নদ-নদীর ভূমিকা অতীব গুরুত্বপূর্ণ ছিল। পরবর্তীকালে জীবন-জীবিকার উন্নতিতেও নদ-নদীকে মানুষ ব্যবহার করেছে। পানির কারণেই মানুষ নদীর কাছাকাছি বসতি স্থাপন ও জীবিকা নির্বাহের উৎসের সন্ধান করেছে। ফলে মানুষের সঙ্গে নদীর সম্পর্ক অবিচ্ছেদ্য হয়ে উঠেছে। বর্তমানকালে এ সম্পর্ক আরও বহুমাত্রিক এবং নিবিড় হয়েছে।

নদ-নদীকে কেন্দ্র করে মানুষ খাদ্যোৎপাদন, মাছ শিকার, পণ্য পরিবহন, ব্যবসায়-বাণিজ্য ইত্যাদি গড়ে তোলার মাধ্যমে স্থায়ী বসতি হিসেবে গ্রাম এবং শহর গড়ে উঠেছে। নদীসমূহ পানিসম্পদে পরিণত হয়েছে। বাংলাদেশে জনসংখ্যার বিস্তার সর্বাধিক ঘটেছে নদীগুলোর তীরে। ফলে অধিকাংশ শহর, গঞ্জ (বাণিজ্য) গড়ে উঠেছে বিভিন্ন নদীর তীরে। এভাবে বুড়িগঙ্গার তীরে ঢাকা, কর্ণফুলীর তীরে চট্টগ্রাম, শীতলক্ষ্যার তীরে নারায়ণগঞ্জ, সুরমার তীরে সিলেট, গোমতীর তীরে কুমিল্লা ইত্যাদি লক্ষ করা যায়।

শিল্প, কলকারখানা প্রতিষ্ঠানেও নদ-নদীর ব্যবহার সবচেয়ে বেশি। আধুনিক পদ্ধতিতে চাষাবাদ করার জন্য আধুনিক সেচ প্রকল্প গড়ে তোলার ক্ষেত্রেও নদ-নদীকে বিশেষভাবে বিবেচনা করা হয়ে থাকে। গঙ্গা-কপোতাক্ষ পরিকল্পনা থেকে দেশের কুষ্টিয়া, যশোর ও খুলনা জেলার বিস্তীর্ণ অঞ্চলে কৃষিজ জমিতে পানি সেচের ব্যবস্থা করা হচ্ছে। এতে ঐ অঞ্চলের মানুষ কৃষি উৎপাদনে লাভবান হচ্ছে। কর্ণফুলী বহুমুখী পরিকল্পনা থেকে ৬৪৪ কি.মি. নৌ চলাচল করছে। ১০ লক্ষ একর জমিতে কৃষিজ ফলন হচ্ছে। পার্বত্য চট্টগ্রামের কান্তাই নামক স্থানে বাঁধ নির্মাণের মাধ্যমে বিদ্যুৎ উৎপাদন করা হচ্ছে। এ বাঁধের ফলে ভয়াবহ বন্যা থেকে চট্টগ্রাম অঞ্চলকে মুক্ত রাখা অনেকাংশে সম্ভব হলেও রাজশাহীতে বাসরত জনগোষ্ঠীর জীবনে এ বাঁধের অনেক নেতিবাচক প্রভাব রয়েছে, যেমন- ভূমি থেকে উচ্ছেদ হওয়া, বিভিন্ন জাতিসত্তার মধ্যে স্থায়ী বিরোধ ইত্যাদি। তিস্তা বাঁধ থেকে রংপুর, বগুড়া ও দিনাজপুর অঞ্চলের মানুষ এখন সুবিধা ভোগ করছে। মেঘনা নদী থেকে পানি নিয়ে বৃহত্তর কুমিল্লা, নোয়াখালী ও চট্টগ্রাম জেলায় চাষাবাদ উন্নত করা সম্ভব হচ্ছে। সারা দেশেই নদীর পানিকে ব্যবহার করে বিভিন্ন কৃষি পরিকল্পনা এখন বিস্তৃত হচ্ছে। এর ফলে দেশের কৃষি অর্থনীতি দিন দিন উন্নত হচ্ছে। মানুষের কর্মসংস্থান ও খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত হচ্ছে। দেশের দক্ষিণাঞ্চলের মানুষের সঙ্গে যোগাযোগের ক্ষেত্রে নদীপথে লঞ্চ ও স্টিমার দিন দিন সম্প্রসারিত হচ্ছে। পরিবহনের জন্যও নদী পথকে বেছে নেওয়া হচ্ছে। ভারতকে ট্রানজিট দেওয়ার ক্ষেত্রেও বিভিন্ন নদী পথকে ব্যবহার করা হচ্ছে। এর ফলে বাংলাদেশ বৈদেশিক মুদ্রা উপার্জনের সম্ভাবনা থাকলেও নানা নতজানু পররাষ্ট্রনীতির কারণে তার সুফল পাওয়া যাচ্ছে না। বাংলাদেশের মানুষের অর্থনৈতিক জীবন ব্যবস্থা উন্নত করা, সুস্বাস্থ্য রক্ষা করা, নির্মল বায়ু ও শহরগুলোর পানির ব্যবস্থা করাসহ জনজীবনকে গতিশীল রাখার ক্ষেত্রে নদ-নদীর ভূমিকা দিন দিন বেড়েই চলেছে। উত্তরাঞ্চলে যেখানে নদী শুকিয়ে যাচ্ছে সেখানে ফসলের ক্ষতি হচ্ছে, জনজীবন হুমকির মুখে পড়তে যাচ্ছে। সে কারণে নদীর নাব্য রক্ষার জন্যে জরুরি উদ্যোগ নেওয়া প্রয়োজন। বাংলাদেশের নগর ও গ্রামের জনজীবন, অর্থনৈতিক ব্যবস্থা টিকিয়ে রাখতে হলে দেশের সকল নদ-নদীকে বাঁচিয়ে রাখতে হবে। সে কারণেই দেশে এখন পরিবেশবাদীরা 'নদী বাঁচাও' জনসচেতনতামূলক কর্মসূচি পালন করছেন।

বাংলাদেশে অঞ্চলভেদে পানির অভাবের কারণ, প্রভাব ও সমাধানের পদক্ষেপ

পানির অভাবের কারণ

বাংলাদেশে অসংখ্য নদ, নদী, খাল, বিল ও হাওড় থাকার পরও বেশকিছু অঞ্চলে পানির অভাব তীব্র হচ্ছে। অঞ্চলভেদে পানির অভাবের কারণের পার্থক্য থাকলেও সাধারণ কতিপয় কারণ রয়েছে।

বাংলাদেশের নদীসমূহে উজান থেকে প্রচুর পানি আসে। এ পানিতে প্রচুর পলি থাকে। এসব পলি নদীর তলদেশে জমা পড়ে। দীর্ঘদিন এভাবে পলি জমা হয়ে বেশকিছু নদীর তলদেশ ভরাট হয়ে গেছে। ফলে নদীগুলোতে চর পড়ে যাওয়ায় পানির প্রবাহ কমে গেছে। তাছাড়া অনেক নদ-নদী বিলুপ্ত হয়ে গেছে। উত্তর বঙ্গ ও দক্ষিণাঞ্চলের জেলাসমূহে এ ধরনের অসংখ্য নদী মৃত নদী হিসেবে পরিচিত হয়ে আছে। নদীগুলোর সজীবতা রক্ষা করতে মাঝেমাঝে তলদেশে জমাকৃত পলি খনন করা প্রয়োজন। বাংলাদেশে নদী খনন করার উদ্যোগ তেমন জোরদার নয়। ফলে অনেক নদীর পানি প্রবাহ ও নাব্য হ্রাস পেয়েছে। তবে স্মরণযোগ্য যে, ঘন ঘন নদী খনন নদীর তলদেশের প্রাণী ও উদ্ভিদের জন্য ক্ষতিকর হতে পারে।

বাংলাদেশের অনেক নদীর উৎপত্তি স্থল ভারতে। ভারতে বেশকিছু নদীতে বাঁধ দেওয়ায় বাংলাদেশের নদীগুলোতে শুষ্ক মৌসুমে পানির প্রবাহ কমে গেছে। এর ফলে এদেশের কোনো কোনো নদী, যেমন- তিস্তা, গঙ্গা, কপোতাক্ষ ইত্যাদি শুকিয়ে যাচ্ছে। ভারতের ফারাক্কা বাঁধ নির্মাণের ফলে দেশের উত্তর-পশ্চিমাঞ্চল ভয়াবহ সমস্যার সম্মুখীন হয়েছে। পদ্মাসহ উত্তরাঞ্চলের সব নদীতেই নেতিবাচক প্রভাব পড়েছে।

বিশেষ করে শুষ্ক মৌসুমে পানির চরম সংকট দেখা দেয়। এর ফলে পরিবেশের ভারসাম্যের উপর পানির অপ্রতুলতার নানা ধরনের নেতিবাচক প্রভাব পড়েছে।

কাজ

দলগত : নদীর প্রবাহ ক্ষীণ বা শুকিয়ে যাওয়ার কারণে কী কী সমস্যার সৃষ্টি হয়েছে, তার একটি তালিকা প্রস্তুত কর।

সেচসহ নানা কাজে কোনো কোনো নদী থেকে পাম্প দিয়ে প্রচুর পানি উত্তোলনের ফলে মূল নদীতেই পানি আশঙ্কাজনকভাবে কমে যাচ্ছে। ফলে নদী তার স্বাভাবিক গতি ও রূপ হারাতে বাধ্য হয়। নিয়মনীতি না মেনে নদীর উপর দিয়ে যত্রতত্র ব্রিজ, কাপ্তান, বাঁধ ইত্যাদি নির্মাণের ফলে অনেক নদী শুকিয়ে যাচ্ছে।

বাংলাদেশে গ্রীষ্ম ও শীতকালে নদীতে পানিপ্রবাহ কমে যাওয়ার কারণে নদী ধীরে ধীরে নাব্য হারিয়ে ফেলছে। এর ফলে বাংলাদেশের সমাজ, অর্থনীতি ও জানজীবন দারুণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে।

বাংলাদেশের অনেক নদী শুকিয়ে যাওয়ার কারণে কৃষি, বাগিচা, মৎস্য চাষ, যাতায়াত ব্যর্থ হয়ে যাচ্ছে। ফলে নদীর তীরে গড়ে ওঠা বসতির জীবন ও জীবিকার সম্বন্ধে তল্লিতল্লা গুটিয়ে অন্যত্র চলে যেতে হচ্ছে। শুষ্ক মৌসুমে ও শীতকালে নদী শুকিয়ে গেলে মাছের অভাব দেখা দেয়। ফলে পর্যাপ্ত আমিষের অভাবে পুষ্টিহীনতা দেখা দিতে পারে। আবার বর্ষাকালে পানিপ্রবাহ বৃদ্ধির চাপে বাড়িঘর ভাঙতে পারে, মানুষজন পৈতৃক ভিটা হারিয়ে নিঃশ্বাস হতে পারে।

নদীপ্রবাহ হারাতে দীর্ঘদিন ধরে নদীকে কেন্দ্র করে যেসব পেশার মানুষ জীবন-জীবিকা নির্বাহ করে থাকে তাদের জীবনে অভাব-অনটন নতুনভাবে সৃষ্টি হতে পারে। নদীর তীরে যেসব গাছপালা, বাগানবাড়ি, সবুজ বৃক্ষের সমারোহ গড়ে উঠেছে সেগুলো পানির অভাবে নষ্ট হয়ে যেতে পারে। তাতে মানুষ, মাছ, পশু-পাখি ও গাছ-তরুলতার অস্তিত্ব বিপন্ন হতে পারে।

আমাদের এসব নদীকে বাঁচাতে হবে। এর জন্যে নদী নিয়মিত খনন করা, নদীর উপর অপ্রয়োজনীয় বাঁধ, পুল, কাপ্তান নির্মাণ না করা, পানির প্রবাহ ঠিক রাখা ও জলাধার নির্মাণের উদ্যোগ নিতে হবে।

যাতায়াত, জলবিদ্যুৎ ও বাগিচ্যের ক্ষেত্রে নদীপথের ভূমিকা

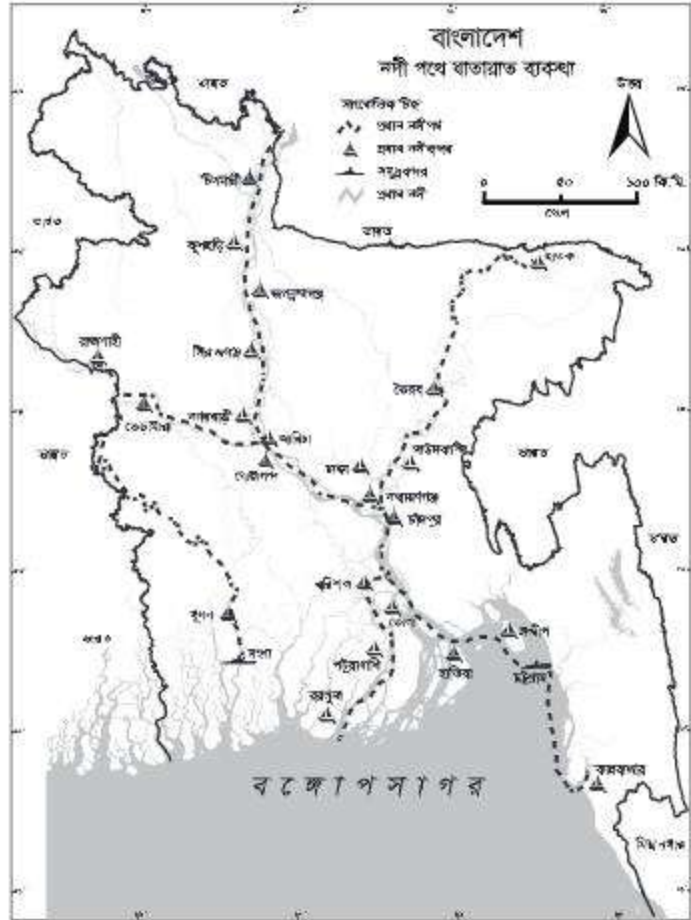
বাংলাদেশের যাতায়াত ব্যবস্থা, জলবিদ্যুৎ ও বাগিচ্যের ক্ষেত্রে নদীপথের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিম্নে উল্লেখ করা হলো:

যাতায়াত : নদীমাতৃক দেশে যাতায়াত ও পরিবহন ব্যবস্থার একটি উল্লেখযোগ্য অংশ নদীগুলোই বহন করছে। পদ্মা, মেঘনা, যমুনা, কর্ণফুলী, সুরমা, কীর্তনখোলা, করতোয়া, তিতাস, কুশিয়ারা, মাতামুহুরী, আত্রাই, মধুমতী, গড়াই ইত্যাদি নদী যাত্রীপরিবহন সেবায় বড়ো ধরনের ভূমিকা পালন করে থাকে। নদীপথকে সকলে আরামদায়ক পথ বলে বিবেচনা করে থাকে। এদেশে নদীপথের দৈর্ঘ্য প্রায় ৯৮৩৩ কিলোমিটার। এর মধ্যে ৩,৮৬৫ কিলোমিটার পথে বছরের সবসময় নৌচালাচল করে থাকে। বাংলাদেশে নদীপথে নৌকা, লঞ্চ, ট্রলার, স্টিমার, নৌট্রাক ইত্যাদি পরিবহনে লক্ষ লক্ষ মানুষ নিজেদের গন্তব্যে পৌঁছাতে সক্ষম হচ্ছে।

জলবিদ্যুৎ : নদী ও জলপ্রপাতের পানির বেগ ব্যবহার করে টার্বাইন যন্ত্রের সাহায্যে যে বিদ্যুৎ উৎপাদন করা হয় তাকে জলবিদ্যুৎ বলা হয়। এটি নবায়নযোগ্য শক্তিসম্পদ। বাংলাদেশের পার্বত্য চট্টগ্রামের কান্দিয়া নামক স্থানে কর্ণফুলী নদীতে নদীর গতিপথে বাধ দিয়ে পাকিস্তান আমলে প্রথম জলবিদ্যুৎ উৎপাদন শুরু করা হয়। সব চেয়ে কম খরচে এ বিদ্যুৎ উৎপাদন করা যায়। বর্তমান বিশ্বে তেল, গ্যাস বা পারমাণবিক চুল্লি ব্যবহারের মাধ্যমে যে বিদ্যুৎ উৎপাদন করা হয় তার উৎপাদন খরচ অনেক বেশি। সেই তুলনায় জল বিদ্যুতের খরচ অনেক কম। সে কারণে দেশের নদীর পানি সম্পদ ব্যবহার করে বিদ্যুৎ উৎপাদন বৃদ্ধি করা বাংলাদেশের অর্থনীতির জন্য লাভজনক। তবে যে ধরনের পাহাড়ী নদী থেকে জলবিদ্যুৎ উৎপাদন করা যায়, সে রকম পাহাড় ও নদী দেশে বেশি নেই। ফলে বাংলাদেশে জলবিদ্যুৎ উৎপাদনের সুযোগ কম।

বাণিজ্য : বাংলাদেশে অভ্যন্তরীণ নৌপথে দেশের মোট বাণিজ্যিক মালামালের ৭৫ শতাংশ আনা-নেওয়া করা হয়। এখন বহুমুখী পণ্যবাহী জাহাজের সংখ্যাও দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। দেশে প্রায় সব নদীপথেই সরকারি বেসরকারি উদ্যোগে লক্ষ লক্ষ টন মালামাল পরিবহন করা হয়ে থাকে। ফলে সকল প্রকার অস্থিতিশীলতার মধ্যেও নির্বিঘ্নে জাহাজ ও নৌযানযোগে পণ্য পরিবহন করা যায়। বর্ষাকালে বেশিরভাগ পণ্যই নৌপথে পরিবহন করা হয়। তবে শুষ্ক মৌসুমে নদীর নাব্য হ্রাস পাওয়ার কারণে কোনো কোনো নদীতে জাহাজ চলাচল সীমিত হয়ে আসছে। দেশের কৃষি, শিল্প ও মৎস্য সম্পদের বিকাশ

ঘটাতে নৌপরিবহনের কোনো বিকল্প নেই। সকল সরকারি বেসরকারি প্রতিষ্ঠান ও সংস্থাকে বাংলাদেশের নৌ বাণিজ্যকে গতিশীল করার জন্যে সুদূরপ্রসারী পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে এগিয়ে আসতে হবে। তাহলে বাংলাদেশের নদীর সর্বোচ্চ ব্যবহার ঘটিয়ে বাংলাদেশ দ্রুত অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি অর্জন করতে সক্ষম হবে।



চিত্র ৫.২ : বাংলাদেশের নদীপথে যাতায়াত ব্যবস্থার মানচিত্র

কাজ
দলগত : নদীর ওপর নির্ভরশীল
কর্মকর্তাদের তালিকা প্রস্তুত কর।

পরিচ্ছেদ ৫.২: বাংলাদেশের প্রাকৃতিক সম্পদ

প্রাকৃতিক সম্পদের ধারণা

প্রকৃতি থেকে প্রাপ্ত সম্পদকে প্রাকৃতিক সম্পদ (Natural Resource) বলা হয়। মাটি, পানি, বনভূমি, সৌরতাপ, মৎস্য, খনিজ ইত্যাদি প্রাকৃতিক সম্পদ।

বাংলাদেশ ও দক্ষিণ এশিয়ার কয়েকটি দেশের প্রাকৃতিক সম্পদ

বাংলাদেশসহ দক্ষিণ এশিয়ার দেশ ভারত, মিয়ানমার ও নেপালের প্রাকৃতিক সম্পদ প্রায় একই রকম। নিম্নে এসব প্রাকৃতিক সম্পদের বিবরণ দেওয়া হলো।

কৃষিজ সম্পদ : দক্ষিণ এশিয়ার দেশ ভারত, বাংলাদেশ, মিয়ানমার এবং নেপাল বৈশিষ্ট্যের দিক দিয়ে কৃষিপ্রধান। এই অঞ্চলের ভূপ্রকৃতি, জলবায়ু, মাটি, নদ-নদী ইত্যাদির উপর নির্ভর করে কৃষকগণ এখানকার কৃষিজসম্পদ উৎপাদন করে। কৃষি উৎপাদনে একটি সুনির্দিষ্ট মাত্রার তাপমাত্রা ও বৃষ্টিপাতের দরকার হয়। এজন্য অঞ্চলভেদে কৃষি উৎপাদনে তারতম্য ঘটে। অত্যন্ত শীতল জলবায়ুর কারণে কিংবা বৃষ্টিপাতের অভাবে ভারতের কয়েকটি অঞ্চলে শস্য উৎপাদনে ব্যাঘাত ঘটে। নেপালে হিমালয়ের পাদদেশে শস্য উৎপাদন সীমিত আকারে হয়। অঞ্চ ভারতের পশ্চিমবঙ্গ, বাংলাদেশ ও মিয়ানমারে নদী বিধৌত উর্বর অঞ্চলে ধান, গমসহ কৃষিজ পণ্য বছরে কয়েকবার উৎপাদন করা সম্ভব। বাংলাদেশে ধান, আলু ও পাটের উৎপাদন ব্যাপক হয়। ভারতের পূর্বাঞ্চলে এবং বাংলাদেশের উত্তর ও পূর্বাঞ্চলের পাহাড়ে চা উৎপাদন হচ্ছে। গম, ভুট্টা, সরিষা ইত্যাদির ফলনও বেশ ভালো হয়। এ অঞ্চলে কৃষিপণ্য উৎপাদনের পিছনে মাটির গুণাগুণ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। ভারত ও মিয়ানমারে তুলা, চা, ডাল, মরিচ ইত্যাদির উৎপাদন বেশ ভালো।

বনজসম্পদ : জলবায়ুগত অবস্থার সঙ্গে বনজসম্পদের সম্পর্ক খুবই ঘনিষ্ঠ। বাংলাদেশ ও দক্ষিণ এশিয়ার দেশ-ভারত, মিয়ানমার ও নেপালের মধ্যে জলবায়ুগত তারতম্য রয়েছে। উষ্ণ ও আর্দ্র জলবায়ু অঞ্চলে সারা বছর প্রচুর বৃষ্টিপাত হয় বলে সেখানে নিবিড় ও বড় বড় অরণ্য বেড়ে উঠেছে। এজন্যই বাংলাদেশের পার্বত্য চট্টগ্রাম, ভারতের পূর্বাঞ্চল ও মিয়ানমারের উত্তরাঞ্চলে চির হরিৎ অরণ্য সৃষ্টি হয়েছে।

মৎস্যসম্পদ : যে কোনো দেশের মৎস্যসম্পদের সঙ্গে সরাসরি ভূপ্রকৃতি ও জলবায়ুর সম্পর্ক রয়েছে। বাংলাদেশে বৃষ্টিপাত, নদ-নদীতে পানিপ্রবাহ, খাল, বিল, হাওড়, পুকুর ইত্যাদিতে পানি থাকায় দেশটি মৎস্য সম্পদে সমৃদ্ধ দেশ বলে পরিচিত। এখানে ছোট বড় নানা প্রকারের মাছ পাওয়া যায়। বঙ্গোপসাগরে মাছের ভাঙার রয়েছে। প্রতিবেশী মিয়ানমার ও ভারতে প্রচুর মৎস্য সম্পদ রয়েছে।

খনিজসম্পদ : বাংলাদেশের পূর্বাঞ্চলীয় পাহাড়ি জেলাসমূহের মাটির নিচে গ্যাস, কয়লা, তেল, চুনাপাথরসহ নানা ধরনের মূল্যবান খনিজ পদার্থের সম্ভাবনা পাওয়া গেছে। এসব সম্পদ আহরণ করে দেশের গ্যাসের চাহিদা মেটানো হচ্ছে। বঙ্গোপসাগরের তলদেশেও গ্যাস আবিষ্কৃত হয়েছে। সেখানে আরও অনেক ধরনের প্রাণিজ এবং খনিজ পদার্থ পাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। ভারত একটি বড়ো দেশ। সেখানে ভূতাত্ত্বিক অবস্থা বৈচিত্র্যময়। ফলে নানা খনিজসম্পদে ভারত অনেক বেশি সমৃদ্ধ। মিয়ানমার খনিজসম্পদে বেশ অগ্রসর অবস্থানে আছে। তুলামূলকভাবে পিছিয়ে আছে নেপাল।

সৌরশক্তি : নিরক্ষীয় নিম্ন অক্ষাংশ অঞ্চলে সূর্য বছরের প্রায় সবসময়ই লম্বভাবে কিরণ দেয়। বাংলাদেশসহ দক্ষিণ এশিয়ার অপর্যাপ্ত দেশগুলো নিরক্ষীয় বা ক্রান্তীয় অঞ্চলে অবস্থিত হওয়ার কারণে এসব দেশ সহজে প্রচুর সৌরশক্তি পেয়ে থাকে। এ অঞ্চলের দেশগুলোতে তাপমাত্রা কখনো নিম্ন পর্যায়ে নামে না। ফলে সূর্যের আলো ছাড়া অম্বকারে বসবাস করতে হয় না। ইউরোপ ও আমেরিকা মহাদেশের বেশকিছু দেশে সূর্য বছরে কয়েকমাস ঝাঁকভাবে কিরণ দেয়, কখনো কখনো সূর্য প্রায় দেখাই যায় না। সে কারণে সেসব দেশে রাষ্ট্র ও জনগণকে বাড়িঘর বসবাসের জন্যে উপযোগী রাখতে প্রচুর জ্বালানি সম্পদ ব্যয় করতে হয়। আমাদের এ অঞ্চলের দেশগুলোকে তা করতে হয় না। আমরা প্রকৃতি থেকে সূর্যের যে আলো অনায়াসে লাভ করি তা অনেক মূল্যবান সৌরসম্পদ। আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে এ সম্পদ দিয়ে আমরা আমাদের বিদ্যুতের চাহিদা পূরণ করতে পারি। আমাদের খাদ্য, চিকিৎসা, বাসস্থানসহ নানা ক্ষেত্রেই সৌরশক্তিকে ব্যবহার করে বাংলাদেশের আরও উন্নতি লাভ করার যথেষ্ট সম্ভাবনা রয়েছে।

কাজ

দলগত : বাংলাদেশের প্রাকৃতিক সম্পদগুলো অর্থনীতির কোন কোন ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছে তার একটি তালিকা তৈরি কর।

দলগত : বাংলাদেশের প্রাকৃতিক সম্পদগুলো সংরক্ষণের ক্ষেত্রে কী কী ধরনের পদক্ষেপ নেওয়া যায়— তার একটি চার্ট তৈরি কর।

পানিসম্পদ ব্যবস্থাপনার ধারণা

মানুষসহ জীব জগতের অস্তিত্বের জন্যে পানির ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তাই পানি অত্যন্ত মূল্যবান সম্পদ। কৃষি ও শিল্পের বিকাশে পানির ব্যবহার অপরিহার্য। বৃষ্টি থেকে পর্যাপ্ত পানি পাওয়া গেলেও শীত ও গ্রীষ্মকালে পানির অভাব হলে কৃষি, শিল্প ও জীবনযাপন সংকটাপন্ন হয়ে ওঠে। সে কারণে সারাবছর পানির প্রাপ্তি, প্রবাহ ও বন্টন নিশ্চিত রাখতে এই সম্পদের ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করতে হয়। পানির পরিকল্পিত প্রাপ্যতা ও ব্যবহারকে পানি ব্যবস্থাপনা বলা হয়। সাধারণত কঠিন, তরল ও বাষ্পাকারে পানি থাকে। শীত ও শুবক মৌসুমে পানির প্রাপ্তি নিশ্চিত করতে নদ-নদী, খাল, পুকুর, হাওড় ও বিলে পরিকল্পিতভাবে পানি ধরে রাখার ব্যবস্থা করার মাধ্যমে পানিসম্পদ ব্যবস্থাপনা করা যায়। আধুনিককালে পানি সম্পদকে মানুষের কল্যাণে ব্যয় করার জন্যে এর ব্যবস্থাপনার ওপর সর্বাধিক গুরুত্ব দেওয়া হয়। নতুবা এ সম্পদের অপব্যবহার, দূষণাপ্রাপ্যতা, রাসায়নিকীকরণসহ নানা কারণে পরিবেশ বিপর্যয় এবং জীব জগতের অস্তিত্ব বিপন্ন হতে পারে।

কাজ

একক : তোমার এলাকার পানি ও খাদ্য নিরাপত্তায় কোন কোন উদ্যোগ নেওয়া যেতে পারে? দেখ।

বাংলাদেশের পানি ও খাদ্য নিরাপত্তায় পানিসম্পদ ব্যবস্থাপনার গুরুত্ব

বাংলাদেশ পৃথিবীর সবচেয়ে ঘনবসতিপূর্ণ দেশ। এত মানুষের খাদ্য, পানি ও অন্যান্য নিরাপত্তা বিধান করা বেশ কঠিন। তাই জনসংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলা খুবই কঠিন হয়ে উঠেছে। দিন দিন এদেশে ভূমি, পানি ও খাদ্য ব্যবস্থাপনাসহ নানা সমস্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে। যদিও স্বাধীনতার চল্লিশ বছরে জনসংখ্যা দ্বিগুণ বেড়েছে, খাদ্যোৎপাদন তিন গুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। এজন্য দেশে তেমন খাদ্য সংকট নেই। কিন্তু পানিদূষণ ও দূষণাপ্রাপ্যতা যেভাবে বেড়ে চলেছে তাতে খাদ্যোৎপাদন ব্যাহত হওয়ার আশংকা রয়েছে। সেজন্যে দেশে পানিসম্পদের সূষ্ঠা ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে জনগণের খাদ্য নিরাপত্তার স্থায়ী সমাধানে সকলকে কাজ করতে হবে। পানি ব্যবস্থাপনার জন্য যে উদ্যোগগুলো নিতে হবে তা হলো—

১. পরিবেশ সংরক্ষণ : নদ-নদী, পুকুর, খাল, বিল, হাওড়, বাওড়, বন ও ভূমির পরিবেশ রক্ষা করতে হবে।
২. পানির সদ্যবহার নিশ্চিত করা : শুবক ও শীত মৌসুমে দেশের সর্বত্র পানির অপব্যবহার দূর করার নীতি ও কৌশল বাস্তবায়ন করতে হবে।

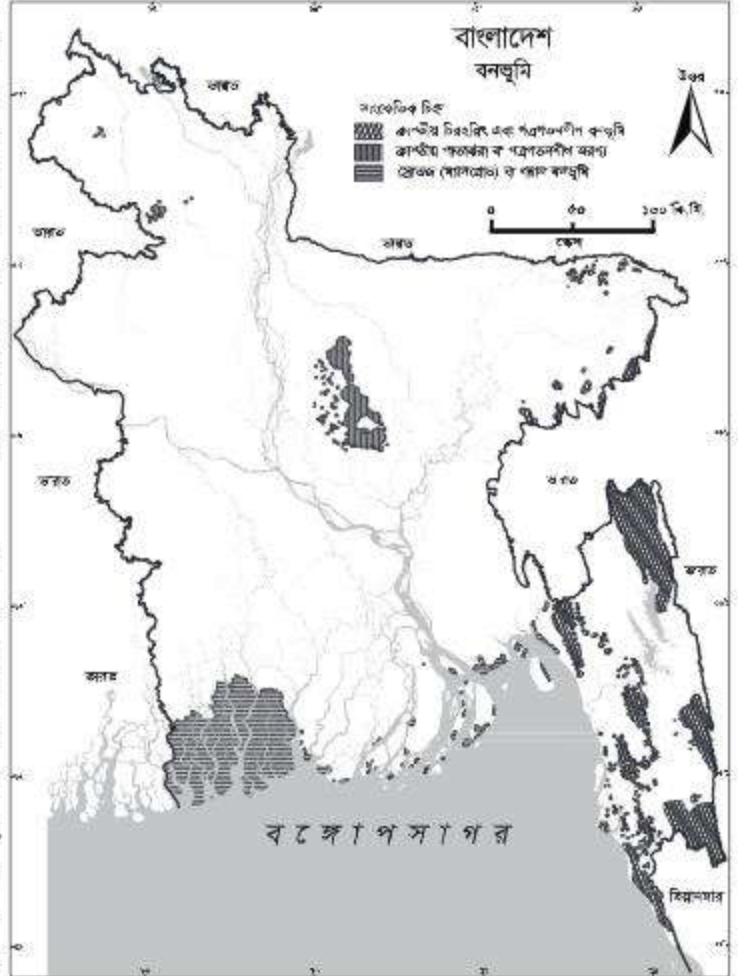
৩. নদ-নদীর নাব্য সংকট দূর করা : দেশের নদ-নদীগুলো পলি পড়ে ভরাট হয়ে যাচ্ছে। প্রায় প্রতি বছর দেশের বিভিন্ন অঞ্চল বন্যা কবলিত হয়ে পানি দূষিত হয়। এটি থেকে পরিত্রাণের জন্য প্রয়োজনীয় প্রতিরোধ ব্যবস্থা, যেমন- বন্যা নিয়ন্ত্রণ এর দিকে নজর দিতে হবে। অনেক নদী শুকিয়ে গেছে। এসব নদ-নদীতে খনন সম্পাদন করলে পানির প্রবাহ এবং সংরক্ষণ সম্ভব হবে। তাতে কৃষি ও শিল্পের জন্য প্রয়োজনীয় পানি পাওয়া যাবে।
৪. সংযোগ খাল ও রিজার্ভার খনন করা : বাংলাদেশের উত্তরাঞ্চলে পরিকল্পিতভাবে কয়েকটি রিজার্ভার খনন করা গেলে শুমক মৌসুমে খাদ্য উৎপাদনে প্রয়োজনীয় পানির চাহিদা পূরণ করা সম্ভব হবে। মাছ চাষ ও প্রজনন স্বাভাবিক থাকবে।
৫. লবণাক্ততা দূর করা : দক্ষিণাঞ্চলের বেশকিছু এলাকায় সমুদ্রের পানির কারণে মাটি লবণাক্ত হয়ে পড়েছে। মাটির উপর পাতলা আবরণ পড়ে ফসল উৎপাদন নষ্ট করে দিচ্ছে। ফলে মিঠা পানির অভাবে মাছ চাষ, কৃষিকাজ, গাছপালা ইত্যাদি ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। এসব এলাকায় মিঠা পানির সরবরাহ স্বাভাবিক রাখার জন্য উজান থেকে স্বাদু পানির প্রবাহ নিশ্চিত করতে হবে। এছাড়া অভিন্ন নদীগুলোর ব্যবস্থাপনায় প্রতিবেশি দেশের সাথে পানি কূটনীতির আন্তর্জাতিক কনভেনশন অনুযায়ী বাংলাদেশের হিস্যা আদায়ে অভিন্ন নদী কমিশনকে কার্যকর করতে হবে। তাহলে পানি ও খাদ্য নিরাপত্তা জোরদার হতে পারে।
৬. নদীভাঙন রোধ করা : বর্ষাকালে কোনো কোনো অঞ্চলে নদী ভাঙনের ফলে নদীতে চর জাগে, নদী ভরাট হওয়ার উপক্রম হয়। দ্রুত সেসব ভাঙন রোধ ও নদীতে ড্রেজিং সম্পন্ন করে পানির প্রাপ্যতা নিশ্চিত করার প্রতি সতর্ক দৃষ্টি দিতে হবে।
৭. পরিমিত সার ও কীটনাশক ব্যবহার করা : আমাদের দেশে দীর্ঘদিন থেকে কৃষিকাজে অপরিমিতভাবে সার ও কীটনাশক ব্যবহারের ফলে পানিদূষণে মাছ ও কৃষি উৎপাদনের ভারসাম্য নষ্ট হচ্ছে। অপ্রয়োজনে সার ও কীটনাশক ব্যবহার করা না হলে পানি ও ভূমির গুণাগুণ অক্ষত থাকবে।
৮. বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির সদ্যবহার : দেশের পানি সম্পদকে মানুষের জীবন-জীবিকার উন্নয়নে কাজে লাগাতে হবে। একই সঙ্গে কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধিতে বৈজ্ঞানিক ধ্যান-ধারণা ও শিক্ষার প্রসার ঘটাতে হবে। প্রযুক্তির ব্যবহারে যত্নবান হতে হবে। দেশের পানিসম্পদ সারা বছরের সকল চাহিদা পূরণ করতে পারলে দেশে কৃষি ও খাদ্য উৎপাদন ক্রমাগতভাবে বৃদ্ধি পাবে। সে কারণে প্রথমে পানির নিরাপত্তা বিধান করতে হবে, তাহলে খাদ্যের নিরাপত্তা নিশ্চিত হবে। এর জন্য দেশে জাতীয় পানি নীতিমালা যথাযথভাবে কার্যকর করার প্রতি দৃষ্টি দিতে হবে।

বাংলাদেশের বনভূমির শ্রেণিবিভাগ

বৃক্ষরাজি যে ভূমিতে সমারোহ ঘটায় তাকে বনভূমি বলা হয়। এসব বনে কাঠ, মধু, মোম ইত্যাদি বনজসম্পদ পাওয়া যায়। বাংলাদেশে পর্যাপ্ত বনভূমি নেই। একটি দেশের মোট আয়তনের ২০-২৫ শতাংশ বনভূমি থাকা প্রয়োজন। কিন্তু বাংলাদেশে এ সম্পদের পরিমাণ রয়েছে মাত্র ১৭% জনসংখ্যা দ্রুত বৃদ্ধি পাওয়ার সঙ্গে মানুষের ঘরবাড়ি এবং আসবাবপত্র নির্মাণে মৃগ্যবান কাঠের প্রয়োজন। এসব কাঠ বনভূমি থেকেই সরবরাহ করা হয়। যার কারণে এ দেশের বনভূমি ক্রমেই কমে যাচ্ছে।

মূলত জলবায়ু ও মাটির ভিন্নতার কারণে এক এক অঞ্চলে এক এক ধরনের বনের সৃষ্টি হয়েছে। বাংলাদেশের বন এলাকাকে মোটামুটি চারটি ভাগে ভাগ করা যায়- চট্টগ্রামের বনাঞ্চল, সিলেটের বন, সুন্দরবন ও ঢাকা-টাঙ্গাইল ময়মনসিংহ অঞ্চলের বনভূমি। উদ্ভিদের বৈশিষ্ট্য অনুসারেও বনাঞ্চলের শ্রেণিবিভাগ করা যায়, যেমন- ১. ক্রান্তীয় চিরহরিৎ এবং পত্র পতনশীল বনভূমি, ২. ক্রান্তীয় পাতাঝরা বা পত্র পতনশীল বনভূমি এবং ৩. স্রোতজ (ম্যানগ্রোভ) বা গরান বনভূমি।

১. **ক্রান্তীয় চিরহরিৎ এবং পত্রপতনশীল বনভূমি** : বাংলাদেশের দক্ষিণ-পূর্ব ও উত্তর-পূর্ব অংশের পাহাড়ি অঞ্চলকে ক্রান্তীয় চিরহরিৎ এবং পত্রপতনশীল বনভূমি এলাকা নামে অভিহিত করা হয়। মূলত উষ্ণ ও আর্দ্রভূমির কিছু এলাকা জুড়ে বিভিন্ন প্রজাতির গাছপালা, তরুলতা, ঝোপঝাড় ও গুল্ম জন্ম নেয়। এসব গাছের পাতা একত্রে ফোটেও না, ঝরেও না। ফলে সারা বছর বনগুলো সবুজ থাকে। সে কারণেই এসব বনকে চিরহরিৎ বা চিরসবুজ বনভূমি বলে। চট্টগ্রাম, খাগড়াছড়ি, রাঙামাটি, বান্দরবান ও সিলেট এই অঞ্চলের অন্তর্ভুক্ত। এ বনভূমির পরিমাণ প্রায় ১৪ হাজার বর্গকিলোমিটার। চাপালিশ, ময়না, তেলসুর, মেহগনি, জারুল, সেগুন, গর্জন এ বনভূমির উল্লেখযোগ্য গাছ। সিলেটের পাহাড়ে প্রচুর বাঁশ ও বেত জন্মে। পার্বত্য চট্টগ্রাম ও সিলেট অঞ্চলে রাবার চাষ হয়।



চিত্র ৫.৩ : বাংলাদেশের বনভূমির মানচিত্র

২. **ক্রান্তীয় পাতাঝরা বা পত্রপতনশীল অরণ্য** : বাংলাদেশের ময়মনসিংহ, টাঙ্গাইল, গাজীপুর, দিনাজপুর ও রংপুর জেলা পাতাঝরা অরণ্যের অঞ্চল। এ বনভূমিতে বছরের শীতকালে একবার গাছের পাতা সম্পূর্ণরূপে ঝরে যায়। শাল বা গজারি ছাড়াও এ অঞ্চলে কড়ই, বহেড়া, হিজল, শিরীষ, হরীতকী, কাঁঠাল, নিম ইত্যাদি গাছ জন্মে। এ বনভূমিতে প্রধানত শালগাছ প্রধান বৃক্ষ তাই এ বনকে শালবন হিসেবেও অভিহিত করা হয়।

ময়মনসিংহ, টাঙ্গাইল ও গাজীপুরে এ বনভূমি মধুপুর ভাওয়াল বনভূমি নামে পরিচিত। দিনাজপুর অঞ্চলে এটিকে বরেন্দ্র অঞ্চলের বনভূমি বলা হয়।

৩. **শ্রোতজ (ম্যানগ্রোভ) বা গরান বনভূমি** : বাংলাদেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাংশ খুলনা এবং দক্ষিণ পূর্বাংশে নোয়াখালী ও চট্টগ্রাম জেলার উপকূলে জোয়ার ভাটার লোনা ও ভেজা মাটিতে যেসব উদ্ভিদ জন্মায় তাদের শ্রোতজ বা গরান বনভূমি বলা হয়। প্রধানত সুন্দরবনে এসব উদ্ভিদ বেশি জন্ম নেয়। সঁাতসৈতে লোনা পানিতে সুন্দরী, গেওয়া, পশুর, ধুন্দল, কেওড়া, বাইন, গরান, গোপপাতা ইত্যাদি বৃক্ষ এ বনভূমির অন্তর্গত।

বাংলাদেশের জাতীয় জীবনে বনভূমি শুধু বনজসম্পদের জন্যেই নয়, আলো, বাতাস, সবুজ-শ্যামল প্রকৃতিতে স্বাস্থ্যসম্মত জীবনের জন্যও এর গুরুত্ব অপরিসীম।

বাংলাদেশের অর্থনীতিতে প্রাকৃতিক সম্পদের গুরুত্ব

বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে প্রাকৃতিক সম্পদের গুরুত্ব অপরিসীম। ভূমি, বনভূমি, মৎস্য, খনিজ পদার্থ, সৌরতাপ, প্রাকৃতিক জলাশয় ইত্যাদি এ দেশের গুরুত্বপূর্ণ প্রাকৃতিক সম্পদ। বাংলাদেশের অর্থনীতিতে এসব প্রাকৃতিক সম্পদকে যথাযথভাবে ব্যবহার করে দারিদ্র্য দূরীকরণ, খাদ্যনিরাপত্তা বিধান এবং উন্নত জীবনমান নিশ্চিত করা সম্ভব। প্রাকৃতিক এসব সম্পদই অর্থনৈতিক উন্নয়নের পথ ত্বরান্বিত করবে। বাংলাদেশের মাটি আমাদের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ সম্পদ। অত্যন্ত উর্বর এই মাটিতে ফসল ফলাতে বেশি পুঁজির প্রয়োজন পড়ে না। মাটির সর্বোচ্চ ব্যবহার করে আমাদের কৃষিজ ফসল, ফুল, ফল, শাকসবজিসহ বনজসম্পদের প্রসার ঘটাতে পারি। বাংলাদেশ স্বাধীনতার চল্লিশ বছরে তিনগুণ খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধি করতে পেরেছে। উন্নত প্রযুক্তি, বীজ, চাষাবাদের নিয়মকানুন মেনে বাংলাদেশ এই মাটিতে আরও বেশি ফসল উৎপাদন করতে পারবে। বিভিন্ন দেশি-বিদেশি ফল ফলিয়ে মানুষের পুষ্টির চাহিদা পূরণ সম্ভব। শাকসবজির দেশীয় চাহিদা পূরণ করে বিদেশে রপ্তানি করা যেতে পারে। তবে ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার চাপ, মানুষের অর্থনৈতিক উন্নতির পাশাপাশি বাড়িঘর, কলকারখানা, পুল, রাস্তাঘাট, শহর-উপশহর নির্মাণে বাংলাদেশের উর্বর ভূমি হ্রাস পাচ্ছে। পরিকল্পিতভাবে প্রাকৃতিক সম্পদ হিসেবে ভূমির ব্যবহার না করা হলে জাতীয় জীবনে বিপর্যয় ঘটে যেতে পারে। সে কারণে বাংলাদেশে ভূমির ব্যবহার আরও বেশি পরিকল্পিতভাবে করতে হবে। আমাদের অর্থনীতিতে প্রাকৃতিক সম্পদ হিসেবে পানির গুরুত্বও বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। বাংলাদেশের নদ-নদী, খাল বিল, হাওড় বীওড়, পুকুর ইত্যাদির পানির ওপর কৃষি ও শিল্প অর্থনীতি সম্পূর্ণরূপে নির্ভরশীল। যোগাযোগ ব্যবস্থাও পানিপথের প্রাকৃতিক সম্পদের উপর অনেকাংশে নির্ভরশীল। দেশের খনিজ, বনজ, সৌরসহ সকল প্রাকৃতিক সম্পদকে ব্যবহার করে দেশ অর্থনৈতিকভাবে সমৃদ্ধ হওয়ার পথে অগ্রসর হচ্ছে। দেশের জাতীয় আয়ের সিংহভাগই আসে এ সব সম্পদকে কাজে লাগানোর মাধ্যমে। দেশে যে সব শিল্প কলকারখানা গড়ে উঠেছে বা উঠছে তার পিছনে রয়েছে দেশীয় প্রাকৃতিক সম্পদের ব্যবহার। এর ফলে মানুষজন কর্মসংস্থানের সুযোগ পাচ্ছে। দেশীয় চাহিদার পণ্য উৎপাদিত হচ্ছে। বিদেশে রপ্তানিজাত দ্রব্যসামগ্রীও এ সব সম্পদকে ব্যবহার করেই তৈরি করা সম্ভব হচ্ছে। অর্থনৈতিক উন্নয়নে নতুন নতুন উদ্যোগ গৃহীত হচ্ছে। প্রাকৃতিক সম্পদের ব্যবহার সেই সব উদ্যোগকে এগিয়ে নিতে সাহায্য করছে। কাঁচামাল হিসেবে প্রাকৃতিক সম্পদের চাহিদা ও জোগান বাড়ছে, পণ্য উৎপাদনে প্রাকৃতিক সম্পদের গুরুত্ব বৃদ্ধি পাচ্ছে। তৈরিকৃত পণ্য দিয়ে দেশীয় চাহিদা পূরণ করে বিদেশে রপ্তানি করা হচ্ছে। এর ফলে দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন সাধিত হচ্ছে। মানুষ খাদ্যশস্য উৎপাদন, বনজ সম্পদের ব্যবহার, প্রাকৃতিক অন্যান্য সম্পদের ব্যবহারে আরও বেশি আগ্রহী ও সচেতন হচ্ছে। এভাবে প্রাকৃতিক সম্পদের যথোপযুক্ত সুষ্ঠু ব্যবহার ও মানুষের নানামুখী অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে দেশের অর্থনীতি দ্রুত পরিবর্তিত হচ্ছে, মানুষ উন্নত জীবনের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে।

কাজ

দলগত : বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে প্রাকৃতিক সম্পদের গুরুত্ব উল্লেখ কর।

অনুশীলনী

সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১. সৌরসম্পদ কাকে বলে?
২. জলবিদ্যুৎ উৎপাদনের সুবিধা কী?
৩. নদী সংরক্ষণ ধারণা তুমি কীভাবে ব্যাখ্যা করবে?

বর্ণনামূলক প্রশ্ন

১. নদীকে কেন্দ্র করে কীভাবে জনবসতির বিস্তারণ ঘটে? ব্যাখ্যা কর।
২. নদীর গতিশীলতা বজায় রাখার জন্য কী কী পদক্ষেপ গ্রহণ করা যায়?
৩. কৃষিজ ও বনজসম্পদের উপর জলবায়ুর প্রভাব বিশ্লেষণ কর।
৪. প্রাকৃতিক সম্পদ সংরক্ষণের গুরুত্ব বিশ্লেষণ কর।
৫. বাংলাদেশের উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে শুষক মৌসুমে পানি সংকট দেখা দেওয়ার কারণ ব্যাখ্যা কর।

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. মাতামুরী নদীর উৎপত্তি স্থান কোথায়?
 - ক. মাইভার পর্বত
 - খ. লুসাই পাহাড়
 - গ. মানস সরোবর
 - ঘ. গাজোত্রী হিমবাহ

২. গজারি বৃক্ষের বৈশিষ্ট্য হলো-
 - i. ঋতুভেদে সকল পাতা ঝরে পড়ে
 - ii. এর পাতাগুলো চিরসবুজ থাকে
 - iii. এটি লবণাক্ত মাটিতে জন্মায়
 নিচের কোনটি সঠিক?
 - ক. i
 - খ. i ও ii
 - গ. i ও iii
 - ঘ. ii ও iii

নিচের অনুচ্ছেদটি পড় এবং ৩ ও ৪ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও

সজীব শিক্ষাসফরে ভারতের পূর্বাঞ্চলের একটি বনভূমিতে গিয়ে দক্ষ করে যে, সেখানকার বৃক্ষগুলো বেশ উঁচু এবং ঘন। শিক্ষক তাদের বলেন যে, বাংলাদেশের একটি অঞ্চলে এরূপ বৃক্ষ প্রচুর পরিমাণে জন্মায়।

৩. সজীবের দেখা বনভূমিতে কোন বৃক্ষ জন্মায়?

- | | |
|----------|-----------|
| ক. সেগুন | খ. বহেড়া |
| গ. শিরীষ | ঘ. ধুন্দল |

৪. বাংলাদেশের কোথায় উক্ত বনভূমির অনুরূপ বনভূমি পরিলক্ষিত হয়?

- ক. টাঙ্গাইল
- খ. দিনাজপুর
- গ. পার্বত্য চট্টগ্রাম
- ঘ. নোয়াখালী

সৃজনশীল প্রশ্ন

১. জাহিদ চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ে। ছুটিতে সে তার বিদেশি সহপাঠীদের সেখানকার বনভূমিতে বেড়াতে নিয়ে যায়। সেগুন, গর্জন, জারুল বৃক্ষশোভিত বনভূমিটির সৌন্দর্য তাদের মুগ্ধ করে। ফেরার পথে জাহিদ তাদের অঞ্চলটির প্রধান নদীটির তীরে নিয়ে যায় এবং বলে যে, তাদের নদীটি অফুরন্ত শক্তির উৎস।

- ক. নাফ কী?
- খ. ব্রহ্মপুত্রের শাখানদী সৃষ্টির কারণ ব্যাখ্যা কর।
- গ. অনুচ্ছেদে বর্ণিত বনভূমিটির বৃক্ষের বৈশিষ্ট্য ব্যাখ্যা কর।
- ঘ. জাহিদের করা মন্তব্যটির যথার্থতা তোমার পঠিত বিষয়বস্তুর আলোকে বিশ্লেষণ কর।

২. আজমল মিয়া দেশের উত্তরাঞ্চলের নদীপাড়ের বাসিন্দা ছিলেন। একটা সময় ছিল যখন তিনি মাছ শিকার করে জীবিকা নির্বাহ করতেন। কিন্তু বর্তমানে নদীটির রূপ পরিবর্তিত হওয়ায় তাকে জীবিকা পরিবর্তন করতে হয়েছে। ভিটামাটি হারিয়ে তিনি নিঃস্ব হয়ে পড়েছেন। তার অঞ্চলে ঋতুবিশেষে পানির চরম সংকট জনজীবনকে বিপর্যস্ত করে।

- ক. বঙ্গোপসাগরের তলদেশে কোন খনিজসম্পদ আবিষ্কৃত হয়েছে?
- খ. দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলোতে প্রচুর সৌরশক্তি পাওয়া যায় কেন?
- গ. আজমল মিয়ার বসবাসকৃত অঞ্চলটির নদীর রূপ পরিবর্তিত হওয়ার কারণ ব্যাখ্যা কর।
- ঘ. অনুচ্ছেদে উল্লিখিত সংকটটি নিরসনে কী ধরনের পদক্ষেপ নেওয়া যেতে পারে? তোমার মতামত দাও।